চতুর্থ অধ্যায়

শূন্যের অসীম ঈশ্বর   
শূন্যের ধর্মতত্ত্ব

নতুন দর্শন সন্দেহ তৈরি করেছে  
আগুন নিভে গেছে  
হারিয়ে গেছে সূর্য ও পৃথিবী   
কেউ জানে না খুঁজবে কোথায়  
সব ভেঙে চুরমার   
সব যোগান, সব সম্পর্ক   
রাজপুত্র, প্রজা, বাবা, ছেলে হয়েছে বিস্মৃত  
  
~ জন ডন, অ্যানাটমি অব দ্য ওয়ার্ল্ড   
  
রেনেসাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শূন্য ও অসীম। ইউরোপ ধীরে ধীরে জেগে উঠল অন্ধকার যুগ থেকে। জেগে উঠল শূন্য ও অসীম। অন্য ভাষায় কিছুই না ও সবকিছু। গির্জার এরিস্টটলীয় ভিত্তি গুড়িয়ে গেল। পথ খুলল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের।   
  
যাজকশ্রেণী বিপদটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। বড় বড় যাজকরা শূন্য ও অসীমের ভয়ানক ধারণা নিয়ে পরীক্ষা চালায়। যদিও গির্জার পছন্দের এ ধারণাগুলো ছিল প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মূলে কুঠারাঘাত। রেনেসাঁ যুগে আঁকা সব চিত্রকর্মের কেন্দ্রে থাকত শূন্য। আর বিশপ ঘোষণা করেছিলেন, মহাবিশ্ব অসীম। সীমানাবিহীন। কিন্তু শূন্য ও অসীমের প্রতি ভালবাসা স্থায়ী হতে পারল না।   
  
গির্জ হুমকির মুখে পড়লে ফিরে গেল সেই প্রাচীন গ্রিক দর্শনে। আবারও গ্রহণ করল বহু বছর ধরে সমর্থন দিয়ে আসা এরিস্টটলের মতবাদ। কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি। শূন্য ততক্ষণে পাশ্চাত্যে আসন গেঁড়ে বসেছে। গির্জার আপত্তি আর কেউ কানে নিল না। শূন্যকে ছাড়তে রাজী নয় বিজ্ঞানসমাজ।   
  
খোসা খুলল বাদামের  
হে ঈশ্বর, বাদামের খোসায় আবদ্ধ হয়ে আমি নিজেকে অসীম জগতের রাজা ভাবলে কি আমি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি?   
--- উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, হ্যামলেট  
  
রেনেসাঁর শুরুতে বোঝা যায়নি শূন্য যে গির্জার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে৷ শূন্য ছিল নিছক একটি শৈল্পিক হাতিয়ার৷ একটি অসীম শূন্যতা, চিত্রশিল্পের মাধ্যমে যা প্রস্ফুটিত হতে থাকে৷   
  
পনের শ শতকের আগের চিত্রশিল্প ও অঙ্কন ছিল প্রাণহীন৷ ছবিগুলো ছিল বিকৃত, দ্বিমাত্রিক ও বিশাল আকারে৷ ছোট্ট ও বিশ্রী প্রাসাদ থেকে চ্যাপ্টা নাইটদের উঁকি মারতে দেখা যেত (চিত্র ১৭)। সেরা শিল্পীরাও বাস্তবধর্মী দৃশ্য আঁকতে পারতেন না৷ তারা শূন্যের শক্তির ব্যবহার জানতেন না।   
  
চিত্র ১৭: চ্যাপ্টা নাইট ও বিশ্রী প্রাসাদ  
  
ইতালীয় স্থাপত্যবিদ ফিলিপো ব্রুনেলেশি প্রথম অসীম শূন্যের ব্যবহার দেখান৷ ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু ব্যবহার করে তিনিই প্রথম একটি বাস্তবভিত্তিক ছবি আঁকেন৷   
  
মাত্রার ধারণা থেকে আমরা জানি, একটি বিন্দু একটি শূন্য৷ দৈনন্দিন জীবনে আমরা ত্রিমাত্রিক বস্তু নিয়ে কাজ করি৷ আইন্সটাইন দেখান, জগতটা আসলে চতুর্মাত্রিক। এটা নিয়ে আমরা পরেও কথা বলব৷ আপনার দেয়াল ঘড়ি, কফির মগ কিংবা এ বইটি সবই ত্রিমাত্রিক জিনিস৷ এখন একটু কল্পনা করুন: একটি বিশাল হাত বইটিকে চাপা দিল। ত্রিমাত্রিকের বদলে বইটি এখন দ্বিমাত্রিক এক আয়ত৷ বইটির একটি মাত্রা হারিয়ে গেছে। এর এখন শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে৷ উচ্চতা নেই৷ এবার ধরুন সেই দৈত্যাকার হাত বইটিকে পাশ থেকে চাপা দিল৷ বইট এখন আর আয়তক্ষেত্রের মতো নেই৷ হয়ে গেছে লাইন৷ আরেকটি মাত্রা কম এখন। নেই প্রস্থ ও উচ্চতা৷ আছে শুধু দৈর্ঘ্য৷ এটা এখন একমাত্রিক বস্তু৷ এই মাত্রাটাকেও উধাও করে দেওয়া যাবে৷ লাইন বরাবর আবার চাপা দিলে লাইন হয়ে যাবে বিন্দু৷ এক অসীম শূন্যতা, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কিছুই নেই৷ বিন্দু আসলে শূন্যমাত্রিক বস্তু৷   
  
১৪২৫ সালে ব্রুনেলেশি বিখ্যাত ফ্লোরেন্টাইন ভবন ব্যাপটিস্টেরির একটি চিত্রের কেন্দ্রে এমন একটি বিন্দু বসান৷ মিলিয়ে গিয়ে বিন্দুতে পরিণত এ শূন্যমাত্রিক বস্ত ক্যানভাসের ওপর অতিশয় ক্ষুদ্র একটি ডট। এর মানে হলো পর্যবেক্ষক থেকে অসীম দূরের বস্তু (চিত্র ১৮)। চিত্রের দূরের দৃশ্যগুলো ক্রমেই এই বিন্দুর কাছাকাছি হয়৷ পর্যবেক্ষক থেকে দূরে গেলে হতে থাকে ছোট থেকে আরও ছোট৷ মানুষ, গাছ বা বিল্ডিং-- সবকিছুই যথেষ্ট দূরে গেলে হয়ে যায় শূন্যমাত্রিক বিন্দু। হারিয়ে যায় দৃষ্টির সীমানা থেকে৷ চিত্রের কেন্দ্রের শূন্য অসীম স্থানকে ধারণ করে৷   
  
আপাত বিরোধী এই বস্তুই ব্রুনেলেশির চিত্রকে জাদুর মতো পাল্টে দিল৷ চিত্রটা ব্যাপ্টিস্টেরি ত্রিমাত্রিক ভবনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলল৷ আসল বস্তুর সাথে যেন পার্থক্যই নেই৷ মজার ব্যাপার হলো ব্রুনেলেশি আয়নায় ভবনটিকে দেখে চিত্রের সাথে তুলনা করেন৷ প্রতিফলিত ছবির সাথে আঁকা চিত্র হুবহু মিলে গিয়েছিল৷ এই ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু দ্বিমাত্রিক অঙ্কনকে ত্রিমাত্রিক ভবনের নিখুঁত নকলে পরিণত করল।

চিত্র ১৮: মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু

মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুতে শূন্য আর অসীমের সম্পর্ক কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। শূন্য দিয়ে গুণ সংখ্যারেখাকে ছোট করে বিন্দু বানিয়ে দেয়। একইভাবে ভ্যানিশিং পয়েন্ট মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাকে একটি ডটের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। এ বিন্দুর নাম সিংগুলারিটি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পরবর্তীতে এ ধারণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে ঐ সময়ে গণিতবিদরা শূন্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিত্রশিল্পীদের চেয়ে বেশি কিছু জানতেন না। পনের শতকে তো আসলে চিত্রশিল্পীরাই ছিলেন সৌখিন গণিতবিদ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অঙ্কনের দৃষ্টিকোণ (perspective) নিয়ে একটি সহায়িকা লিখেছিলেন। চিত্রশিল্প নিয়ে তাঁর আরেক বইয়ে আছে এক সতর্কবাণী, “গণিতবিদ না হলে আমার লেখা পড়বে না।" এ গণিতবিদ-চিত্রশিল্পীরাই দৃষ্টিকোণ পদ্ধতিকে নিখুঁত করে তোলেন। অল্প দিনের মাথায় দেখা গেল, এরা যেকোনো বস্তুকে তিন মাত্রায় ফুটিয়ে তুলতে পারছেন। শিল্পীরা মুক্তি পেলেন সমতলের মতো চিত্রের হাত থেকে। শূন্য বদলে দিয়েছে শিল্পের জগতকে।।

আক্ষরিক অর্থেই শূন্য ব্রুনেলেশির চিত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করছিল। গির্জাও শূন্য এবং অসীম নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখল। যদিও গির্জার মতবাদ তখনও এরিস্টটলের ওপর নির্ভরশীল। জার্মান কার্ডিনাল নিকোলাস অব কিউসা ব্রুনেলেশির সমসাময়িক মানুষ। তিনি অসীমের ধারণা দেখেই ঘোষণা করেন, “টেরা নন এস্ট সেন্ট্রা মুন্ডি।" । পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। গির্জা তখনও বোঝেনি এ ধারণা কত বৈপ্লবিক হতে পারে।

মধ্যযুগীয় এরিস্টটলীয় মতবাদের একটি পুরনো ও শক্তিশালী কথা ছিল, “মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবী অনন্য ও বিশেষ একটি জিনিস, যার মতো নেই আর কিছু।" এ কথাটাও ভ্যাকুয়ামের নিষেধাজ্ঞার মতোই শক্তিশালী ছিল। এ কথা অনুসারে, পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থানের কারণে শুধু পৃথিবীতে প্রাণ ধারণের উপযোগী পরিবেশ আছে। এরিস্টটল মনে করতেন, সব বস্তু তাদের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পেতে চায়। পাথর বা মানুষের মতো ভারী জিনিসের স্থান ভূমি। বাতাসের মতো হালকার বস্তু থাকবে আকাশে। এ কথার ছিল নানান ফলাফল। এর অর্থ দড়ায়, গ্রহরা বায়ুর মতো হালকা জিনিস দিয়ে তৈরি। আরেকটি অর্থ হলো আকাশের মানুষ ভূমিতে পড়ে যাবে। ফলে বাদামের মতো মহাবিশ্বের খোলসের ভেতরের কেন্দ্রেই শুধু প্রাণীরা বাস করতে পারবে। অন্য গ্রহে প্রাণ থাকার ভাবনা এক গোলকের দুই কেন্দ্র থাকার মতোই হাস্যকর।

টেম্পিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চাইলেই ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি করতে পারেন। টেম্পিয়ের জোর দিয়ে বললেন, ঈশ্বর এরিস্টটলের যেকোনো নিয়ম ভাঙতে পারেন। ঈশ্বর চাইলেই অন্য পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। হাজার হাজার অন্য পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। সবগুলোতে থাকতে পারে প্রাণের অস্তিত্ব। এটা ঈশ্বরের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। এরিস্টটল কী বললেন তাতে কিছু যায়-আসে না।

নিকোলাস অব কিউসা তো আরও এক ধাপ বেশি সাহসী। তিনি বললেন, ঈশ্বরে আসলে সেটাই করেছেন। তিনি বলেন, “অন্য তারার অঞ্চল আমাদের একইরকম। আমাদের বিশ্বাস, এদের কোনোটাই প্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়নি।" আকাশে আছে অসীমসংখ্যক তারা। আকাশে জ্বলজ্বল করে গ্রহরা। চাঁদ ও সূর্য থেকে আসে আলো। আকাশের তারারা কেন আমাদের গ্রহ, চন্দ্র বা সূর্যের মতো হতে পারবে না? হয়তোবা তারা পৃথিবীকে উজ্জ্বল্ভাবে জ্বলতে দেখে, যেভাবে আমরা দেখি তাদেরকে।" নিকোলাস নিশ্চিত ছিলেন, ঈশ্বর আসলেই অসীমসংখ্যাক অন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সরে গেল মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে। নিকোলাসকে তবুও ধর্মদ্রোহী বলা হয়নি। নতুন ভাবনার প্রতিও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি গির্জা।

এবার কাজে নামলেন আরেক নিকোলাস। তিনি নিকোলাসের দর্শনকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের রূপ দিলেন। নিকোলাস কোপার্নিকাস দেখালেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। ঘুরছে বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে।

সন্ন্যাসী ও চিকিৎসক কোপার্নিকাসের বাড়ি পোল্যান্ড। গণিত শিখেছিলেন জ্যোতিষবিদ্যার কাজ সহজ করার জন্য। যাতে করে তাঁর রোগীদের চিকিৎসা আরও ভাল করা যায়। ফলে কাজ করতে হলো গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে। আর তা করতে গিয়ে দেখলেন গ্রহদের গতিবিধির হিসাব রাখার গ্রিক নিয়ম অনেক অনেক জটিল। টলেমির ঘড়িসদৃশ আকাশ ছিল দারুণ নিখুঁত। যেখানে পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে। তবে এ মডেল ছিল মারাত্মক জটিল। বছরজুড়ে গ্রহরা আকাশে চলাচল করে। তবে মাঝেমধ্যে থেমে যায়। চলতে থাকে পেছন দিকে।